দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৮ সেপ্টেম্বর ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-সবার জন্য শিক্ষা

অধ্যাপক এসএম সাইফউদ্দীন

পৃথিবীর জনসংখ্যা বর্তমানে ৫২৫০ কোটি। তন্মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি লোক বর্তমানে অক্ষর-জ্ঞানহীন। এর বেশীর ভাগ হচ্ছে মহিলা। এশিয়া মহাদেশে তিন-চতুর্থাংশ নিরক্ষর রয়েছে যাদের মোট সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৬ কোটি ৭০ লক্ষ। নিরক্ষরতার মান-চিত্র আর দারিদ্র্যের মানচিত্র একই। একজন নিরক্ষর বলেই সে দরিদ্র এবং যেহেতু সে দরিদ্র সেহেতু সে নিরক্ষর। বিশ্বের সকল উন্নয়নশীল দেশেই এই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে উন্নতদেশে যারা ব্যবহারিক শিক্ষায় কোন দিন শিক্ষিত হয়নি সেই শ্রেণীর লোকজন সাধারণতঃ বেকার দলের অন্তর্ভুক্ত। এতে প্রতীয়-মান হয় যে, নিরক্ষরেরা এক বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং তারা দেশের সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি-বন্ধকস্বরূপ।

বর্তমান সমাজে যারা বিত্তবান এবং যারা অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী তারাই সমাজের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। অন্যদিকে যারা দরিদ্র এবং নিরক্ষর তারা সমাজের নূন্যতম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরাই নিরক্ষর এবং তারা কোনদিনই কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ পায় না। ফলে তারাই সমাজে সকল হতাশা ও বঞ্চনার শিকার। এদের সংখ্যাই সমাজে সবচেয়ে বেশী।

সাম্প্রতিককালে এক জরীপে দেখা যায় যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার নির্ভর হার হ্রাস পেয়েছে। কারণ অনেক অভিভাবকই এখন বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে চাকরি লাভের সার্টিফিকেট হিসাবে দেখে না অথবা শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির জীবনযাত্রার উন্নতি হতে পারে বলে মনে করে না। এ ছাড়া একথা অপ্রিয় হলেও সত্যি যে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে ব্যবধান বর্তমানে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও বিকাশের কোন পথ নেই। শিক্ষক ক্লাশে এসে তোতা পাখীর মতন পড়ান তাতে ছাত্ররা কোন আকর্ষণ পায় না এবং ধীরে ধীরে তাদের যে আকর্ষণ পূর্বে ছিল তা লোপ পায়। এই ধারা যদি চলতে থাকে তাহলে নিরক্ষরতা দূরীকরণ তো দূরের কথা বর্তমান আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় তা আরও বৃদ্ধি হবে।

এই প্রেক্ষাপটে দেশের জাতীয় অংগীকার এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং অগ্রাধিকার থাকতে হবে। সাক্ষরতা কর্মসূচীকে সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে হবে। কিছু বই প্রণয়ন বা ছাপানো বা গ্রামে গ্রামে কিছু পাঠ কক্ষ স্থাপন করার মাঝে সাক্ষরতা কর্মসূচীর সাফল্য বয়ে আনবে না বরং যতক্ষণ না নিরক্ষর লোকদের মধ্যে সাক্ষরতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি না হয়, ততদিন সাক্ষরতা কর্মসূচীর সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়।

সাক্ষরজ্ঞানহীন কারা? কেনই বা তারা সাক্ষরজ্ঞানহীন? কারণ, এরা এমন একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যারা কোনদিন বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পায়নি বা পেলেও একসময় বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে। তারা জীবনের কোন একসময় কিছুটা সাক্ষরজ্ঞান অর্জন করেছিল কিন্তু পরবর্তীতে উপযুক্ত সাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচীর অভাবে তারা পুনরায় নিরক্ষর হয়ে পড়েছে।

তাহলে সাক্ষরতার সংজ্ঞা কি? প্রত্যেক দেশে এই সংজ্ঞা স্ব-স্ব দেশের প্রয়োজনের ও চাহিদার ভিত্তিতে স্থির করা হয়ে থাকে। এক দেশের সংজ্ঞা অন্যদেশের সংজ্ঞার সাথে মিল নাও থাকতে পারে। এসময় ছিল যখন টিপসই দেবার ক্ষমতাকে বলা হতো সাক্ষরতা।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী সাক্ষরতার সংজ্ঞা ছিল : "পড়ে বুঝে ছোট চিঠি লিখতে পারার ক্ষমতাই সাক্ষরতা"। আর ইউনেস্কোর সংজ্ঞা হচ্ছে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ হিসাবে যে সাক্ষরতা কার্যক্রম গৃহীত হয় তাকেই ব্যবহারিক সাক্ষরতা বলে"।

একটি সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সমাজ তৈরী করা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একার দায়িত্ব নয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রত্যেকেরই ভূমিকা আছে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সফল হয় যখন স্বাস্থ্য, চাকরি, কৃষি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একইভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সহযোগিতা ও কর্মসূচী সমন্বয়ের সাধনের মাধ্যমে স্বল্পসময়ে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। নিরক্ষরতা দূরীকরণে সামগ্রিক সমন্বিত পদক্ষেপ থাকা দরকার। আর একটি বিষয় হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থায় যতদিন মেরুকরণ থাকবে অর্থাৎ শিক্ষা-ব্যবস্থায় যতদিন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সফল হবে না।

ইউনেস্কো গত কয়েক বছর যাবত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে একটি দ্বিমুখী শিক্ষা-ব্যবস্থা চালুর জন্য প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই ব্যবস্থায় একদিকে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে শক্তিশালী করা এবং অন্যদিকে সাক্ষরতা কর্মসূচীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা এবং একই সংগে মেয়েদের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এ বছরে 'আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস' উপলক্ষে ইউনেস্কোর শ্লোগান হচ্ছে-'একটি মেয়েকে শিক্ষিত করতে পারলে একটি জাতিকে শিক্ষিত করা যায়।'

গণশিক্ষা কার্যক্রম কাদের নিয়ে হবে? বিদ্যালয় বহির্ভূত, বিদ্যালয় ত্যাগী এবং ঐ সমস্ত কিশোর-কিশোরী যাদের পক্ষে এখন আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তাদেরকে গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা। গণশিক্ষা কার্যক্রমে এদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকারী উপরোক্ত বয়ঃসীমার জনগোষ্ঠীকে এই কর্মসূচীর আওতায় নিরক্ষরমুক্ত করা সম্ভব হবে।

১৫-৩৪ বছর-বয়ঃসীমার নিরক্ষর ও স্বল্প অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন জনগোষ্ঠী দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি। জাতীয় মূল্যবোধ, কৃষি, পশু সম্পদ, মৎস্য-সম্পদ ও শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন তরান্বিতকরণ, পরিবার-পরিকল্পনা, শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, টিকাদান, পুষ্টি এবং শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার উপর যে দেশের ভবিষ্যত নির্ভরশীল সে সম্পর্কে উপরোক্ত জনগোষ্ঠীর সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন গণশিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় সম্ভব হবে।

পল্লী এলাকা বিশেষতঃ পল্লীর নারীসমাজ এবং সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণীর মধ্যেই গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় তিন চতুর্থাংশ নিরক্ষর। ১৯৫১ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত দেশের শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, আমাদের অবস্থানের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই আছি। বিগত ১৫ বছরে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা মাত্র ৫৮ লাখে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু নিরক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১ কোটি ৯২ লাখ। ১৯৫১ সালে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৬ লাখ। ১৯৯০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৮ কোটির কাছে পৌঁছেছে। দেশের বর্তমান জন্মহার অপরিবর্তিত থাকলে জনসংখ্যা হবে প্রায় ১৫ কোটি ২ হাজার সাল নাগাদ।

এই সময়ের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ কোটি ৮ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর এবং ৬ কোটি ২৩ লাখ বয়স্ক লোকের জন্য সাক্ষরতা কর্মসূচীর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে ২ হাজার সাল নাগাদ 'সবার জন্য শিক্ষা'-এর লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে।

হাতে সময় রয়েছে আর মাত্র ৯½ বছর-২ হাজার সাল নাগাদ "সবার জন্য শিক্ষা" কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে। বর্তমানে দেশে ৪৪ হাজার ৮শ ৩৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ১ কোটি ১২ লাখ ১৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এ হিসেবে আরও ৩০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা গেলে এবং এর পাশাপাশি বাংলাদেশে ২ হাজার সাল নাগাদ 'সবার জন্য শিক্ষা'-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব।

'সবার জন্য শিক্ষা' প্রচেষ্টার লক্ষ্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় যেখানে অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে তা' দূর করার লক্ষ্যে একই সাথে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রায় শেষের দিকে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমান সমস্যার আলোকে এই প্রচেষ্টা ছিল অপ্রতুল। নিরক্ষরতা সমস্যা যেখানে পর্বতপ্রমাণ সেখানে, ১৯৮০ সালের চালুকৃত গণশিক্ষা কর্মসূচীকে ১৯৮২ সাল থেকে বন্ধ করে প্রায় ৫½ বছর দায়সারা গোছের একটি দুর্বল পরিকল্পনা গ্রহণ করে গণশিক্ষা কার্যক্রম তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকল্প কাঠামোর ব্যবস্থাপনার দিক থেকে কোন সুষ্ঠু রূপরেখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কারণ বিগত সরকারের এব্যাপারে কোন রাজনৈতিক অঙ্গীকার না থাকায় গণশিক্ষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী প্রতিদিন খুঁড়িতে খুঁড়িয়ে চলছিল।

গণশিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয় বহির্ভূত কিশোর যুবকদের জন্য এবং বয়ঃপ্রাপ্তদের অক্ষরজ্ঞানের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষা হবে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। গণশিক্ষা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত অক্ষরজ্ঞানের মধ্য দিয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়ন মোটামুটি দু'টি ধারণা ঘিরে উঠতে পারে। যেমনঃ ক. দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নিরক্ষরতা সবচেয়ে বড় অন্তরায়। খ. বিদ্যালয় বহির্ভূত, বিদ্যালয় ত্যাগী তরুণদের এবং নিরক্ষর বয়স্কদেরকে সাক্ষরতাদানের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যার তাৎপর্য জাতীয় পর্যায়ে সুদূরপ্রসারী। উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে এ দু'টি বিষয় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক হবে। জাতিকে গড়বার জন্য অন্যান্য প্রধান প্রধান পরিকল্পনা ও তার গতিবেগ বৃদ্ধির ব্যাপারেও এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

নিরক্ষরতার সাথে দারিদ্র্য, অপুষ্টি, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, প্রভৃতি নিবিড়ভাবে জড়িত। অনেকে কারণ হিসাবে বলেন যে, তৃতীয় বিশ্বের মানুষ দরিদ্র বলেই এসব সমস্যা দেখা

(৫-এর কঃ দ্রঃ)